বামুনবাড়ি

মৈত্রেয়ী কুমার

টুনির জীবনের তিন দশক পার হয়ে গেছে কবেই। দিন যাপনের চালচিত্রের পটেও পড়েছে কাল বদলের কত রূপরেখা। বাবা চলে গেছে। ভাই বোন যে যার মত ব্যস্ত। ব্যস্ত টুনি নিজেও, তার উপর বহু বছর দেশছাড়া। দেশের সাথে নাড়ির টানটুকু বলতে একমাত্র মা। মায়ের শরীরটা ভালো যাচ্ছে না জেনেও কাজের চাপে টিকিট করে উঠতে পারছিল না টুনি। তারপর, সেদিন ভোরের দিকে ঘুম ভেঙে সদ্য ফোটা স্নিগ্ধ গোলাপের মত মন নিয়ে বিছানায় শুয়েছিল টুনি। ওর সমস্ত মনের পটভূমিকা জুড়ে ছিল স্বপ্নে দেখা লাল টুকটুকে ইঁটের দেওয়াল, সবুজ দরজায় কালো কালো বড় দুটো কড়া বসানো বামুনবাড়ি। সেই বামুনবাড়ি, যে তার সবটুকু স্নেহ ভালোবাসা প্রশ্রয়ের সোনার কাঠি রূপোর কাঠির পরশ দিয়ে জীবন্ত করে রেখেছিল তাদের শৈশবের নির্মল দিনগুলি। কতদিনের কত আমোদ আহ্লাদ, কত বিস্ময় ভয়, কত স্নেহ-আদরে ওই বাড়ির মানুষগুলো টুনিদের দিয়েছে অনুভূতিতে স্বস্তি, প্রাণে আরাম। সে বাড়ি কি আজও তেমনই তার মধুরিমা নিয়ে আছে? মায়ের টানের সঙ্গে বামুনবাড়ির প্রতি টানও যে অবিচ্ছেদ্য তার প্রমাণ টুনি পেল যখন এই স্বপ্ন দেখার সপ্তাহখানেকের মধ্যেই সে নিজেকে এয়ারপোর্টে হাজির করতে পারলো। টিকিট করেই মাকে জানালো, ‘তোমাকে বড্ড দেখতে ইচ্ছে করছে মা, আমি আসছি।’

তারপর সারাটা স্মৃতিপথ জুড়ে কেবল বকুল ফুলের গন্ধ।

টুনটুনির মা ছিল গরীব ঘরের মেয়ে, তারপর গরীব ঘরের বৌ। চির রুগ্ন টুনটুনির বাবা, ওরা দুই বোন। নুন আনতে পান্তা ফুরনোর পাঁকে ভরা সংসারে জীবন সৌন্দর্য্যের পদ্মফুল ফোটাতে উদয়াস্ত পরিশ্রম করত ওর মা।

প্রতি বিষ্যুদবারে লক্ষ্মীপূজো করে মা। সব কাজ সারতে বেলা গড়িয়ে দুটো। ভিজে এলো চুল পিঠে ছড়িয়ে কপালে ছোট্ট সিদুঁর বিন্দু এঁকে আটপৌরে শাড়ি পরে ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে মা এসে বসে শোওয়ার ঘরের এক কোনে পাতা মা লক্ষ্মীর আসনের সামনে। সকালের ইস্কুলের পাট চুকিয়ে টুনি ততক্ষণে বাড়িতে। খালি গায়ে ইজের পরে খাটের উপর বসে মন দিয়ে তালগাছের ছবি আঁকছে। খাটের গায়ে হেলান দিয়ে বসে সুর করে পাঁচালী পড়ে মা। মাঝে মধ্যে মায়ের গলা ধরে আসে। একটানা সুরের ছন্দপতনে টুনি মায়ের দিকে আকৃষ্ট হয়। মায়ের গলা দুটো কচি হাতে জড়িয়ে ধরে বলে, ‘কাঁদছো মা?’ মা ওর দিকে জল ভরা চোখে ফিরে তাকায়। মধুর হেসে ইশারায় মাথা নাড়ে — ‘না! না!’

আনমনে সামনের ক্যালেণ্ডার দেখে টুনি। আজ কি মাসের শেষ তারিখ? মাসের শেষের দিনগুলো যে বিশেষ বদ, সে টুনি বেশ বুঝতে পারে। বাবার মুখ থাকে গম্ভীর। মা উদ্বিগ্ন। ওর দিদি যায় ইংরিজি ইস্কুলে। টুনিও সেই ইস্কুলে দুই ক্লাস পড়েছে। পরে ধারদেনার চাপে কাহিল বাবা সংসারের সুরাহায় ওকে বাংলা ইস্কুলে ভর্তি করায়। ইংরিজি ইস্কুলের হাজার ফ্যাচাং। হাঁচতে কাশতে টাকা। টুনির দিদি একদিন গোমড়া মুখে মাকে বললে, ‘টিফিনে রুটি আলুভাজা দিও না, ভারি লজ্জা করে খেতে!’ শুনে মা ম্রিয়মাণ হয় আর টুনি হয় যারপরনাই অবাক। ‘রুটি- আলুভাজা খেতে তো বেশ ভালোই লাগে রে, দিদি,’ বলে সে। দিদি কঠিন গলায় বকা দেয়, ‘তোকে পাকামো করতে হবে না।’

বাঙালীর বারো মাসে তেরো পাবন। তার সবগুলো না হলেও দোল, দুর্গোৎসব, লক্ষ্মীপূজো, কালীপূজো টুনিদের ছেলেবেলার জীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ ছিল। মহালয়ার পূণ্যদিনে ছোট বলে রেয়াত করত না মা। ভোর চারটেয় শুরু হবে চণ্ডীপাঠ, তার আগে বাথরুম ঘুরে এসে দাঁত মেজে টুনিদের তৈরী হয়ে থাকতে হত। মা ছোট্ট রেডিওটা বগলে করে ওদের নিয়ে ছাদে উঠে মাদুর পেতে বসতো, স্তব্ধ হয়ে শুনত চণ্ডীপাঠ। পাঠের অর্দ্ধেক রাস্তা পৌঁছিয়ে দিদি দম হাঁপিয়ে মাদুরেই লম্বা হয়ে পড়ত। আর টুনি তো প্রথম পাঁচ মিনিটেই আউট। ছেঁড়া ছেঁড়া তন্দ্রায় কানে আসত পাঠ করতে করতে লোকটা কেঁদে ফেলেছে। আবার কখনো বীর হুঙ্কারে আহ্বান দিচ্ছে অসুরকে আবার কখনো কি করুণসুরে প্রার্থনা জানাচ্ছে দুগ্গা মাকে। আর ভেসে আসত মনের আকাশে সুরের শুকতারা হয়ে জ্বলা সেইসব গান!

‘বাজল তোমার আলোর বেণু’-র সুরের সঙ্গেঁ লাল সূর্য্য উঁকি দিত পূব আকাশে। পাখিরা ডাকত যখন, তখন শেষ হত চণ্ডীপাঠ। শঙ্খে তিনবার ফুঁ বাজলে মা হাতজোড় করে প্রণাম করে গাছে গাছে জল দিত। আর টুনিরা সাজি হাতে দৌড়ত কুলতলির মাঠের কোণে বিজনকাকুদের শিউলি গাছের তলায়। সেখানে তখন আরো পাড়ার ছেলেমেয়ের দল।

ছোট গল্প ঃ বামুনবাড়ি

সে কি ফুল কুড়োবার ধূম! কার সাজিতে কত ফুল এই প্রতিযোগীতা। সাধ্য মতন ফুল কুড়িয়ে টুনির কচি আঙুলে তখন কমলা রঙের আলপনা। সেদিন বাড়িতেও সাজো সাজো ভাব। বাবা রেলপাড়ে কালোদার দোকানের ইয়া বড়-বড় জিলিপি, সিঙাড়া আনত। ভুরভুর করত সারা বাড়ি ভাজা মিঠে গন্ধে। মা স্নান সেরে তোলা শিউলির মালা গেঁথে কি সুন্দর সাজাত ঠাকুরকে।

পূজোর মুখে একই ছিট্ কাপড় দিয়ে দু বোনকে ফ্রক বানিয়ে দিত মা। অষ্টমীর সকালে বাবা অনেক দূরে দূরে বাগবাজার, আহিড়ীটোলা, কুমারটুলি, শোভাবাজার, মহম্মদ আলী পার্ক — আরও কত জায়গার ঠাকুর দেখাতে নিয়ে যেত। ছোট ছোট পায়ে বিপুল উৎসাহে বাবার হাত ধরে হাঁটত টুনি। ওই একদিন বাবা হত কল্পতরু। রাস্তার ধারে ফেরিওয়ালাদের থেকে ঝালমুড়ি, ঘুগনি, চুরণ কি গোলাপী রঙের বুড়ির মাথার পাকা চুল নামের একটা মিষ্টি চুষি লাঠির দেদার সৎব্যবহার চলত।

বাবা রাজবাড়ির দুর্গামণ্ডপগুলোতে নিয়ে গিয়ে রাজবাড়ির ইতিহাস গল্প করে শোনাত।মণ্ডপ সজ্জার কাজ দেখাত। যাঁরা দুগ্গাঠাকুর বানাতেন সেই শিল্পীদের নাম নিত। সেই বয়স থেকেই টুনিরা জেনেছিল কুমারটুলির কথা। সেখানকার শিল্পীদের অধ্যবসায়, পরিশ্রমের কথা।

এমন প্রাণবন্ত বাবা গম্ভীর হয়ে যায় মাসের শেষের দিনগুলোতে। এমনই দিনে শেষ সন্ধ্যার দিকে পিছনের গলিদরজার উপরের টিমটিমে আলো জ্বেলে টুনিকে চুপিচুপি ডাক দেয় মা, ‘আয়।’ — ‘কোথায় মা?’ নিজের ঠোঁটে আঙুল দিয়ে মা ইশারা করে, ‘চুপ!’ তারপর ওর হাত ধরে নির্জন গলিপথে নামে মা।

মোড় ঘুরে দ্বিতীয় গলির শেষে লাল টুকটুকে সবজে দরজার বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ায় ওরা। মা যেন বড় সঙ্কোচে কালো কালো বড় দুটো কড়া নাড়ে ঠুক-ঠুক-ঠুক। দরজা খুলে যায়। মুহূর্তে মিলিয়ে যায় পড়াপথের ম্লানতা ভরা গ্লানি। বামুনবাড়ির সব ঘরে ঘরে আলো, রেডিওর গান — ‘ও আকাশ সোনা সোনা, এ মাটি সবুজ সবুজ।’ বামুনবাড়ির ব্যস্ত দালানকোঠা, ওদের বাড়িভর্তি লোক, হাসির হররা, ব্যস্ততার রকমারি ভঙ্গী — হা হয়ে দাঁড়িয়ে দেখে টুনি।

ততক্ষণে ভেতরবাড়ি থেকে বেরিয়ে আসে বড়মা। ফোকলা দাঁত, ধবধবে সাদাচুলে বাঁধা বড়ি খোপা, আটপৌরে থান ধুতি, গোল নিকেলের চশমার পিছনে কৌতুকভরা দুটো চোখ। ‘কে-ডা! অ-মা! রেণু! আসো আসো,’ মুখের ছাঁচি পান সামলে বড়মা বলে ওঠে। ভুরভুর করে চারিপাশে ছড়িয়ে পড়ে কি মিষ্টি জর্দার গন্ধ!

রান্নাঘরে কড়াইতে ফোড়ণ ফেলে বড় জ্যাঠাইমা হেঁকে বলে, ‘কে? রেণু! একটু বসে যাস।’ কালো গোলগাল, একমাথা চুল শক্ত বিনুনী বাঁধা বড় জ্যাঠাইমার গম্ভীর মুখে হাসি ফোটে টুনির মাকে দেখে।

মা যখন বড়মার ঘরে, টুনি ততক্ষণে এক ছুটে চিলেকোঠায় দীপদাদার ঘরে। মেজজ্যাঠার ছেলে দীপদাদা হয়তো তখন রঙীন মাছের কাঁচ জলাশয়ে মাছেদের তড়িবত করে খাওয়াচ্ছে। কখনো বা ওদের ছাদঘরের সামনে, যেখানে ডাঁই করে রাখা বিশাল বিশাল চৌখুপ্পি রঙীন ঘুড়ি, সেখানে বসে লাটাইয়ে কাঁচ মেশানো চিক্‌চিকে মাঞ্জা মাখাচ্ছে। স্থান কাল পাত্র ভুলে বিভোর হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে টুনি। এ বাড়ির সদস্যদের কাছে সে মায়ের সাথে ফাউ। তার আবাহনও নেই, বিসর্জনও নেই। এ বাড়ির অন্দরমহলে তার অবাধ গতি। এত রং, এত আলো, কোলাহল কলরবের মাঝে টুনি আচ্ছন্ন হয়ে থাকে।

সাদা পালকে ঢাকা লাল ঝুঁটি কাকাতুয়াকে ছোলা দানা খাওয়াতে খাওয়াতে মেজো বা সেজো জ্যাঠা হয়তো বলেন, ‘যা টুনি! মা-রে বল্ পোসাদ দেবে অনে।’ বলতে হয় না, বড়মা কর্পূর জর্দার গন্ধ মেখে সামনে এসে দাঁড়ায়। টুনির কচি মুঠি খুলে সন্ধ্যাপ্রসাদী গুজিয়া ভরে দিয়ে বলে, ‘এ্যাহন্ যা! পরে আইবি ’অনে। তর কান ফুটা করতে আইতে লাগব না?’ কান ফুটা? বলে কি! ওই স্বপ্নপুরীতে বড়মাকে অকস্মাৎ সাক্ষাৎ রাক্ষুসীবুড়ি মনে হয় টুনির। সে আহত চোখে তাকায় মায়ের দিকে। মা হেসে বলে, ‘সুন্দর সুন্দর দুল পরতে হবে না?’

মায়ের সাথে ফিরতে মন চায় না টুনির। তার শিশু চোখে বামুনবাড়ির প্রতিটা ঘরে, অলিন্দের বাঁকে কত অজানাকে জানা, অচেনাকে চেনা বাকি রয়ে যায়। মাকে মনে হয় সভা পণ্ড করা তালকাটা রাজার মতন।

ছোট গল্প ঃ বামুনবাড়ি

ফিরতি পথে বাড়ির পাঁচিলে ধবধবে সাদা প্যাঁচাকে নীরবে বসে থাকতে দেখে থমকে দাঁড়ায় মা। গলায় আঁচল জড়িয়ে প্রণাম করে অস্ফুটে বলে, 'লক্ষ্মীর বাহন।' তখনই মায়ের আঁচল প্রান্তে টুনি দেখে গিঁট বাঁধা। ঘরে এসে ওই গিঁট খুলে দু-দশ টাকা মা রান্নাঘরের কৌটোয় তুলে রাখে। টুনি জানে ওই টাকা বড়মা দিয়েছে মাকে। মাসের শেষে সংসারের আর্থিক টানাটানিতে বড়মার থেকে পাওয়া ওই স্বস্তিটুকু নিয়ে কোনোদিন মাকে প্রশ্ন করে লজ্জায় ফেলতে চায়নি টুনি।

গরীব বলে কিন্তু টুনি কখনো মাকে অগোছালো অসুন্দর দেখেনি। স্নান সেরে পাট ভাঙা শাড়ি আর কোমর ছাপানো ভেজা চুলে, মৃদু সিঁদুর বিন্দুতেই অপরূপা হয়ে উঠত মা।

টুনির পরিচিত এই স্নিগ্ধ মায়ের রূপ ফি বছর দুগ্গাপূজোর পর দশমীর দিনে একেবারে পালটে যেত। কুলতলির বিরাট মাঠে প্যাণ্ডেল বেঁধে দুগ্গাপূজো হত। দশমীর দিনে দুগ্গাঠাকুরকে সন্দেশ খাইয়ে সিঁথিতে সিঁদুর পরিয়ে আবার আসছে বছর বাপের ঘরে আসার জন্য প্রার্থনা জানাতে যেত মা। লাল পাড় সাদা শাড়িতে খসখস আওয়াজ তুলে ব্যস্ত হাতে বরণডালা সাজাত। চেয়ে চেয়ে টুনি দেখত, লাল সিঁদুরকৌটো, সবুজ কচি দুব্বো ঘাস, সোনা রং ধানের শিষ, ছোট ছোট পানের খিলি, বাটি ভরা নরম সন্দেশে আর জ্বলজ্বলে ধাতব মুদ্রায় কি স্নিগ্ধ কোমলতা আর ভক্তিরসে পূর্ণ হয়ে উঠত মায়ের বরণথালাখানি। মা গোছাতে গোছাতে বলত,'যাবি?'

গিয়েছে টুনি। কি ভিড়! কি ভিড়! দুগ্গাঠাকুরের সামনে রাখা বাঁশের সিঁড়ি চেপে মা যখন ঠাকুরের সমান সমান হয়ে যায়, কি ভয় টুনির! পাছে মা পড়ে না যায়! বরণপর্ব চুকলে টুনিকে বাড়িতে দিয়ে মা চলে যায় বামুনবাড়ি। পিছনবাগের খিড়কি দোরে আলো জ্বেলে রাখে বাবা। সন্ধ্যে পার করে ফেরে মা। খিড়কি দোরে আওয়াজ হলেই বাবা বলে,'ওই ফিরল! চেহারাখানা যা খোলতাই হয়েছে, দ্যাখ গে যা!'

টুনি একছুটে যায় বাইরে। মায়ের লাল টুকটুকে রক্তজবার মতন মুখমণ্ডল। সাদা চোখে আর দাঁতে টুনিকে দেখেই হাসি। সারা মাথার চুল লাল, গলা বুকেও লাল রঙের প্লাবন। ছোট্ট বুকের ধুকপুকুনিটুকু সামলে রেখে মায়ের সামনে দু হাত কোমরে রেখে দাঁড়িয়ে থাকে টুনি। মা ওর হাতে বরণডালা ধরিয়ে দিয়ে বলে, 'এটা ধর, কলতলা হয়ে আসি।' পায়ে পায়ে টুনিও কলতলায়। মুখে গায়ে মাথায় সাবান ঘষে মা। টুনিকে সাক্ষী মেনে হেসে হেসে বলে, 'বড়দি, মেজদি আর ভালোদিটা কি বাড়াবাড়ি করল দ্যাখ!' মায়ের আটপৌরে সংসারের চালচিত্রে ওই 'বাড়াবাড়ির' আনন্দের মূল্য যে কি সীমাহীন ছিল তা আজ বোঝে টুনি।

আবার দোলপূর্ণিমার দুপুরে টুনিদের রং পিচকারির দৌরাত্ম মিটলে ওদের নাইয়ে ধুইয়ে ছোট ছোট লাল গোলাপী আবীরের প্যাকেট হাতে মা বামুনবাড়ি যেত। ফিরত যখন মুখখানা ওই মা লক্ষ্মীর বাহন প্যাঁচার গায়ের বরণসম সাদা। চুলে লাল হলুদ গোলাপীর আল্পনা। পরণের শাড়িতে বৃন্দাবনের বসন্ত ফাগ। হাতে থালা ভরা মিষ্টি থাকত মায়ের। জিবে গজা, গুজিয়া, নিমকি। টুনি আর ওর দিদি ছুটে সামনে গেলে মিষ্টির থালা হাতে দিয়ে মা বলত, 'বড়মা দিয়েছে। বাবাকে দাও, আর তোমরা দু বোনে ভাগ করে খাও।'

বামুনবাড়ি ছিল মায়ের বজ্র আঁটুনি সংসার দেওয়ালের বাতাস ভরা বাতায়ণ। মায়ের সহজ সরলতা বামুনবাড়ির সদস্যদের মন জয় করেছিল। অভাবের মাঝেও মায়ের স্বভাব সৌন্দর্য্যবোধে তাদের আড়ম্বরহীন জীবনও যে কত শৃঙ্খলাবোধ আর পরিপাটি ছিল ভাবতে গিয়ে অবাক হয় টুনি।

দুগ্গাপূজোর আগে একমাস পূজার ছুটি। হিল্লী-দিল্লী যাওয়ার সাধ্য তাদের নেই। তাতে অবশ্য টুনির মনে কোনো হেলদোল নেই। মহানন্দে বইপত্র শিকেয় তুলে রাখে। দুপুরে খাওয়া দাওয়ার পর দিদিও যখন মায়ের পাশে শুয়ে শুকতারা, আনন্দমেলার পাতা ওলটাচ্ছে, মায়ের অর্ধতন্দ্রালু চোখে ঘুম নামল বলে, টুনি চুপিসাড়ে উঠে সোজা ছাদে।

ছাদের ডানপাশে পড়শিদের বিশাল আমগাছ। ডালে ডালে মুকুল, মঞ্জরী। কত পাখির আনাগোনা, ডাক। ছাদের সামনেই নীল আকাশের অর্দ্ধেক জুড়ে অসংখ্য শাখা প্রশাখার বিস্তার মেলে এক মহাবৃক্ষ নিম। আকাশজোড়া ওই মহাবৃক্ষকে দেখে ছোট্ট টুনি বেজায় ভয় পেত। যদিও ছাদে বেড়াতে বেড়াতে মা বলত নিমের হাওয়া খুব স্বাস্থ্যকর, তবু পারতপক্ষে ছাদের ওইদিকে খেলত না টুনি।

সে এক খেলাঘর ছিল বটে। মায়ের হাতে লাগানো ফুলগাছের টবগুলোকে নিরীহ ফাঁকিবাজ পড়ুয়া বানিয়ে টুনি নিজে হত দায়িত্বশীল রাশভারী রাগী শিক্ষিকা। ছাদে ফেলা ছোঁড়া কঞ্চিগুলোকে হাতের বেত বানিয়ে দমাদম টব-প্রহার চলত। খিদে পেলে কুছ পরোয়া নেহি! ছাদের রোদ্দুরে মায়ের বানানো আমের আচার, কুলের আচারের মোটা মোটা, সাদা কাপড় জড়ানো বয়েমগুলো আছে কি করতে! কোনোদিন আবার শিক্ষকতার কাজে ইস্তফা দিয়ে সুগৃহিণী হয়ে যেত টুনি। পেঁপের কটা বিচি মায়ের কাছে পেয়ে সে কি উল্লাস তার। পেঁপের বিচি নিয়ে দুপুরে লাল ইঁট ঘষে ঘষে দিব্যি রগরগে ডিমের ঝোল বানিয়ে ফেলত সে। এক অবোধ শিশু তার ঘর সংসার খেলায় মত্ত। মাথার উপর মধ্যাহ্নের তপ্ত সূর্য্য। নীল নীঃসীম আকাশে চীলগুলো তীক্ষ্ম ডেকে ঘুরে ঘুরে ওড়ে। হলুদ দুপুর আরো ঘন হয়। একটানা ডেকে ঘু ঘু পাখি জানান দেয় জন্মজন্মন্তরের এই খেলাভাঙার খেলার ফাঁক ফোঁকরে সেও কোথাও যেন সামিল আছে টুনির সঙ্গে।

— 'লং ক্লথ্!! বি-উ-টি- ফুল! অপূর্ব!' এই কথা কটা কানে যেতেই ডিম রান্না ফেলে ছাদের কার্নিশে ঝুঁকে পড়ে টুনি। সাদা ধুতি পাঞ্জাবী, সাদা কেডস জুতো পায়ে, সাদা বোঁচকা পিঠে, সাদা পাকা চুলের এক ফেরিওয়ালা এক মনে হেঁকে হেঁকে চলে যায়। এরপর থালা বাটি বাজিয়ে আসে 'খাগড়াই কাঁআসার বাসুউন' বিক্রেতা। তারপর আতাফলওয়ালা। আর দুপুর গড়িয়ে গেলে খঞ্জনী বাজিয়ে এক তিলক কাটা অন্ধ বুড়ো জালনায় এসে বলে, 'মা!' টুনি ওই ডাক শুনেই নীচে নেমে আসে। জানে, মা আড়মোড়া ভেঙে জড়ানো গলায় হাঁকবে, 'টুনি-ই!' তখন রান্নাঘরে হরলিক্সের শিশিতে জমানো খুচরো পয়সা থেকে কুড়ি পয়সা এনে দিতে হবে ওই বুড়ো ভিখিরিকে। টুনির নিত্যদিনের দ্বিপ্রাহরিক দায়িত্ব!

বিকেলে যত্ন করে দু বোনের চুল বেঁধে দেয় মা। কোনো কোনোদিন বিশেষ আবদারে ছাদের টবের কোন মরশুমী ফুল গুঁজে দেয় বিনুনীতে। কুলতলির মাঠে ঝেঁপে দৌড়তে যায় টুনি। পাড়ার আরো ছেলেমেয়েরা মিলে সে কি খেলার ধূম। চু-কিতকিত, কাবাডি-কাবাডি, কখনো কুমীর তোমার জলকে নেমেছি, কখনো ব্রতচারী, কখনো লুকোচুরি। শীত শুরুর সূর্য্যের পাটে বসার তাড়া লেগে যায়। বাড়ি ফিরে কলতলায় পা ধুয়েই মায়ের সাথে সা রে গা মা আর গানের রেওয়াজে বসতে হবে। নইলে কান মলে মা বলবেই, 'সারাদিন শুধু টো-টো করলেই হবে?'

তাই একমাথা কমলা আকাশে, মাঠের ধারে কালো ছায়া ঘেরা নারকোল বনের সীমা ছাড়িয়ে ঘরমুখী পানকৌড়ির ঝাঁকের সাথে পাল্লা দিয়ে টুনিও ঘরমুখো ছোটে। কোনো দিন দেরী হলে নারকোল বনের মাথায় চাঁদ একফালি ফিচ্‌কে হাসি মুখে নিয়ে বলে, 'আজ তোর হবে!' ফিরতি পথে টুনি দেখে সাইকেল চেপে আঁকশি হাতে আসছে আলোকাকু। সাইকেলে বসেই আঁকশি দিয়ে গলির আলোদুটো টুক টুক জ্বেলে দিয়ে যায়।

গরমের দুপুরে রোদের তাত বাড়লে ছাদে যাওয়া মানা। সে সব দিনগুলোতে টিনের সুটকেশ থেকে রং পেন্সিল আঁকার খাতা বার করে টুনি। কারুকৃতি করতে করতে দেখে মা একদৃষ্টে দেওয়ালে ঝোলানো বালক কৃষ্ণের ক্যালেণ্ডারের দিকে তন্দ্রালু চোখে তাকিয়ে রয়েছে। ফ্যানের হাওয়ায় কৃষ্ণঠাকুর বেড়ে দোল খাচ্ছেন। হঠাৎ টুনির কানে আসে — 'কু-ল-ফি-ই — মা-লা-ই—ই!' এই মালাইওয়ালার আছে একটা টিনের বাক্স। খোপে খোপে কাটা। নীচে খড়বিচালীর কুটো জড়ানো বরফের চাঙর দেওয়া। খোপের মাঝে কাঠিতে জড়ানো ক্রীম রঙা কুলফি মালাই। 'মা!' সাবধানে ডাকে টুনি। মা ঘুরে তাকায় টুনির দিকে। ধীরে বলে, 'যা।' টুনি এক লাফে খাট থেকে নেমে রান্নাঘরে হরলিক্সের শিশি থেকে পয়সা নিয়েই একছুটে বাইরে। কোনোদিন মর্জি হলে দিদিও এসে দাঁড়ায়। কুলফির ডাঁটি ধরে আপ্রাণ চুষতে চুষতে বিনা কারণে হি হি হাসে দুই বোনে।

এরকমই এক অলস দুপুরে মায়ের পাশে জমিদারী ঢং-এ পায়ের উপর পা তুলে শুয়ে বাঁটুল দি গ্রেট পড়ছে টুনি। সারা পাড়া নিঝুম। হঠাৎ বিষম জোরে চীৎকার করে ওঠে মা। দাঁত মুখ কুঁচকে ছটফট করতে করতে দিদিকে বলে, 'বড়মাকে ডাক।' দিদি এক ছুটে বেরিয়ে যায়। বাঁটুলদাকে উল্টে ফেলে পাথরের মতন বসে আছে টুনি। নরম গলায় মাকে বলে,'কি হয়েছে মা?' ব্যথাভরা মুখেও হাসি টেনে মা বলে, 'ও কিছু নয়। পেটে ব্যথা।' তারপর ওকে কাছে টেনে বলে, মাকে নাকি কিছুদিন হাসপাতালে যেতে হবে। টুনি যেন লক্ষ্মী হয়ে থাকে। বাবাকে না জ্বালায়। রোদে না খেলে। পড়াশোনা করে।

ইতিমধ্যে শশব্যস্ত হয়ে বড়মা, বড় জ্যাঠাইমা দিদির সাথে ঘরে ঢোকে। কিছুক্ষণ পরে বামুনবাড়ি থেকে ফোনকল পেয়ে ট্যাক্সি হাঁকিয়ে আসে বাবা। মা চলে যায়। কোথা থেকে কি হয়ে গেল ভেবে টুনি যখন প্রায় কাঁদো কাঁদো, দিদি মাথায় চাঁটি মেরে বলে,'কাঁদছিস কেন বোকা! শি ইজ প্রেগনাণ্ট! তোর মতন হাঁদুও এবার দিদি হতে যাচ্ছে!'

সামনেই কালীপূজো। প্রতি বছর বাবা পূজোর আগে ওদের দু বোনকে বাজির বাজার বাগড়ি মার্কেটে নিয়ে যায়। মা থাকলে বলত, 'আজ রোদের তাত খুব চড়া। ছাদে একটা খবরের কাগজ বিছিয়ে বাজিগুলো রোদে দে।' এবার বাজিই কেনা হল না তো রোদে দেওয়া! ব্যাজার মনে এসব ভাবছে টুনি, বাবা কাছে এসে দাঁড়ায়। 'কি করছো?' টুনির সামনে 'টুনটুনি আর বিড়ালনী'র গল্পের বই খোলা, বাবা দেখতে পাচ্ছে না? কোনো জবাব দেয় না টুনি। বাবা কাছে এসে ওর মাথায় হাত রেখে বলে, 'কাল তোমাদের একটা ভাই হয়েছে। আজ বিকেলে তোমাকে হাসপাতালে নিয়ে যাব। ভাই আর মাকে দেখতে পাবে।' আনন্দে মন ভরে যায় টুনির। মা-হীন জীবন কি বিচ্ছিরি!

সন্ধ্যেবেলা একটা লাল ফ্রিল দেওয়া জামা পরে বাবার সাথে রিকশা চেপে টুনি চলে ভাইকে দেখতে। ঘোর কালো অমানিশার রাত। আকাশের বুকে মাঝে মাঝে এ কোন ও কোন থেকে হীরের কুচির মতন ফুটে উঠছে বাজির আলো। সাঁই করে বেরিয়ে যাচ্ছে আলোর রকেট। কোথাও কারও বারান্দায় ঝমর ঝমর শব্দ আর হাজার সোনা রুপার রং-এর ফুলকি তুলে ফুটছে তুবড়ি। কখনো বা শব্দ বোমার বিকট আওয়াজে ছোট্ট বুক ভারী হয়ে আসছে তার। মৃদুমন্দ তালে ছুটে চলেছে রিকশা। হঠাৎ কি যে হল, রাস্তার খানাখন্দ, গর্ত, নালানর্দমা থোড়াই কেয়ার করে প্রাণের দায়ে প্রবল বেগে ছুটতে শুরু করল রিকশাওয়ালা। রিকশার চাকাদুটো যেন কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে তাবড় তাবড় দ্বৈরথীদের প্রচণ্ড পরাক্রমী ব্যুহ্য মাঝে পড়ে ভাঙা হেরো রথচক্রের মতন লফর ঝফর করতে করতে, হেলে দুলে, চাচা আপন প্রাণ বাঁচার খোঁজে ঘুরতে লাগল। টুনি আর বাবা তখন এক রিকশা-ভূকম্পের হতভম্ব সওয়ারি। দুজনে ক্রমান্বয়ে দুদিকে দুলছে। বাবা চ্যাঁচাচ্ছে,'অ্যাই রিকশা! রোকো, রোকো! কেয়া হুয়া কেয়া? অ্যাঁ?' আর হুয়া কেয়া! রিকশাওয়ালার ইন্দ্রিয়াদি তখন মগজাস্ত্রের তুণছাড়া বেয়াড়া শরমাত্র। দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য। এবার বাবার সুর ছাপিয়ে রিকশাওয়ালা বিকট গলায় চেল্লাতে শুরু করে,'মর গিয়া রে, অ্যাই বাপ্! মর গিয়া! চুহা বাজি ছোড় দিয়া রে...।'

কৌতুহলী পথচারীরা এই দুরন্ত রিকশা রেসের আশে পাশে দাঁড়িয়ে পড়েছে। তাদেরই ক'জনা বাবাকে হেঁকে বললে, 'ও মশায়! সব্বোনাশ! আপনার রিকশার পিছনে ছুঁচোবাজি ছেড়েছে। দেকবেন, রিকশাওয়ালা ডাণ্ডা যেন..।' তাদের বলা আপ্তবাক্য রিকশার গতির সাথে তাল মিলিয়ে ছুটে চলে, সমাপ্ত হতে পারে না। তবু পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝে নিতে অসুবিধে হয় না বাবার। যে রেসুড়ে ঘোড়ার মতন ব্যাটা ছুটে চলেছে তাতে রিকশার ডাণ্ডাদুটো যদি হাত ছেড়ে যায়, তাহলে কচি মেয়েটার কি হবে ভেবে বাবা এবার রিকশায় নাচতে নাচতে তারস্বরে চ্যাঁচাতে লাগলো, 'খবরদার! ডাণ্ডা মত্ ছোড়ো! ডাণ্ডা মত্ ছোড়ো!'

রিকশাওয়ালা আর বাবার মিলিত কোরাস 'বাঁচাও! বাঁচাও!' আর 'ডাণ্ডা মত্ ছোড়ো!' ক্রমান্বয়ে চলতে থাকলো। পথচারীরা কেউ বিভ্রান্ত, কেউ হাসছে, কেউ চিন্তিত। টুনির মনের অবস্থা অবর্ণনীয়। একমনে সে তখন বাবার কথার অনুসরণে কালীঠাকুরকে ডেকে যাচ্ছে, 'রিকশাওয়ালা যেন ডাণ্ডি না ছাড়ে হে কালীঠাকুর!' কালীর কল্যাণে শেষপর্য্যন্ত রিকশাওয়ালার ডাণ্ডি অভিযান রীতিমতো সফল হয়। শরীরের দুশ ছয় খানা হাড় আস্ত নিয়ে টুনি আর বাবা হাসপাতালের দোরগোড়ায় নামে। বাবা বেজায় খুশী হয়ে একটাকা বকশিশ দেয় রিকশাওয়ালাকে। সেও মহাখুশি। ওই শীতে কাঁধের গামছায় সারা শরীর বেয়ে দরদর ঝরা ঘাম মুছে টুনিকে কোলে করে রিকশা থেকে নামায় সে। বাবাকে হাতজোড় করে বলে, 'হামি ডাণ্ডা কি ছোড়বো বাবু! হামি কি জানে না যে খোঁকী আছেন আমার গাড়িতে?' বিপন্ন রিকশাওয়ালার ওই স্নেহ মাখা কথা কটা আজও স্মৃতির মণিকোঠায় হীরে হয়ে জ্বলে টুনির।

দিদি হয়ে টুনির দায়িত্ব বাড়ে। দুপুরে এখন আর ফুলের টবে বেত পিটিয়ে ছাত্র পড়ানো কি হাঁদা-ভোঁদা নিয়ে বসলে চলে না। মা কাজ দিয়েছে গান গেয়ে ভাইকে ঘুম পাড়াবার।

এমনই এক দুপুরে টুনি যখন ভাই-এর উপর তার সঙ্গীত বিদ্যার ফলিত প্রয়োগে ব্যস্ত, হঠাৎ প্রচণ্ড এক কাড়া নাকাড়ার শব্দে নিঝুম পাড়া কেঁপে ওঠে। তাস পার্টির ঢক্কানিনাদ আর মুহূর্মুহু হাত চটাপটির আওয়াজের সাথে সম্মিলিত হেঁড়ে গলায় কারা যেন বলে ওঠে, 'কই গো, কোথায় গেলে গো, কার ঘরে গো!' মার দিকে তাকিয়ে টুনি দেখে মার মুখ ভয়ে রক্তশূন্য ফ্যাকাসে। ঠকঠক করে কাঁপছে মা। চোখ বড় বড় করে টুনির দিকে ইশারা করে মা, 'চুউপ!'

টুনির ভাইকে কাঁথায় জড়িয়ে, মুখে দুধের বোতল গুঁজে, অন্য হাতে টুনিকে ধরে নিঃশব্দে ছাদে উঠে আসে মা। নীচের শোরগোল তখন উচ্চগ্রামে। ওরা তিনজনে ঘাপটি মেরে পাঁচিলের আড়ালে বসে আছে। এ কি বিপদ! কোথায় এখন

লাল কমল নীল কমল ঘোড়ার পিঠে চড়ে রাক্ষুসীরানীর খোঁজে যাচ্ছে সেটা রুদ্ধশ্বাসে পড়ে শেষ করবে, তা নয়, কাদের ভয়ে মায়ের সাথে ছাদে বসে কাঁপছে ও? অধৈর্য্য ভরা ভয়ের সুরে টুনি শুধোয়, 'ওরা কারা, মা?' মা ফিসফিস করে, 'হিজড়ে!'

শিশুমনের এক আশ্চর্য্য সমীকরণ থাকে মাতৃমনের সাথে। অচিরেই হিজড়ের দল টুনির চোখে হয়ে ওঠে রাক্ষুসীরাণীর মতন ভয়াল-ভয়ঙ্কর।

আসল বিপদ আসে ঠিক দু দিন পরে। টুনি ইস্কুলের বাস থেকে গলির মোড়ে নেমেছে। ভর দুপুর বেলা। পিঠে বইয়ের ব্যাগ, গলায় খালি জলের বোতল। সবে দু পা এগিয়েছে, দেখে গলির অপর দিক থেকে এক দঙ্গল হিজড়ে আসছে! ওর আর হিজড়েদের মাঝে পড়ে আছে শুধু গলি জোড়া নিঃসীম শূন্যতা! কি হবে এখন! যাদের ভয়ে মা পর্য্যন্ত ঠকঠক কাঁপে, ভয়ে লুকোয়, তাদের সাথে পারবে ও? এক্ষুনি ওকে ওই ঝোলায় পুরে না জানি কোথায় নিয়ে যাবে! আর কোনোদিন বাবা মা দিদিকে দেখতে পাবে না। ছোট্ট ভাই জানতেও পারবে না ওর ছোট্ট দিদি হারিয়ে গেছে!

না, আর দেরী নয়! ধরলো বলে! দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে পিছন ফিরে বড় রাস্তা ধরে দৌড়তে শুরু করে সে। রাস্তায় একা আসা ওর জন্য একেবারে বারণ কিন্তু সামনে যে বিপদ! বড় রাস্তা থেকে দ্বিতীয় গলি ধরে ছুটতে ছুটতে নিজেকে এনে হাজির করে বামুনবাড়ির সামনে। যেন নিজের বাড়ির পরে এটাই তার স্বাভাবিক আত্মরক্ষার আস্তানা! 'দরজা খোল! দরজা খোল!' বাড়ির দরজায় আছড়ে পড়ে সে। দরজা খোলে স্বয়ং বড়মা। হুমড়ি খেয়ে পড়ে টুনি কর্পূর জর্দার কোলে। 'কি রে মা! কান্দস্ ক্যান? কি হইল কি?'

'হিজড়ে! হিজড়ে! আমাকে ধরে নিয়ে যেতে এসেছিল!' বামুন মা প্রমাদ গোনে। অগত্যা বড় নাতি দীপুকে সঙ্গে দেয় টুনিকে বাড়ি পৌঁছে দিতে।'কোনো ভয় নাই! বাড়ি যাও! মা ভাববে 'অনে!'

দীপুদাদার সাথে গলির মোড় ঘুরে টুনি তো অবাক! দেখে ওদের বাড়ির খিড়কি দোরে ভাই কোলে দাঁড়িয়ে স্বয়ং মা। এক বুড়োগোছের হিজড়ে ভাইয়ের মাথায় হাত রেখে বিড়বিড় করছে। বাকিরা ইতি উতি বসে। মায়ের মুখ স্মিত। 'কাকিমা,' দীপুদাদা ডাকে। 'তোমার মেয়ে এদের দেখে ভয়ে প্যান্টে হিসু করে ফেলেছিল আর কি! আমাদের বাড়ি গিয়ে হাজির। সে কি কান্না! বড়মা পাঠালো আমাকে পৌঁছে দিতে।' দীপুদাদার খিকখিক হাসিতে খলখল করে যোগ দেয় হিজড়ের দল। মাথায় এক চাঁটি মেরে দাদা বলে, 'যা !'

কি মিথ্যে বলতে পারে বড়রা! আর মা-ই বা কি? যাদের ভয়ে সেদিন ছাদে বসে কাঁপল আজ তাদের সাথে হেসে কথা বলছে? ভারি রাগ হয় টুনির। গোঁজ হয়ে বসে থাকে। কিছুপরে মা সামনে এসে দাঁড়ায়। বলে, 'খুব ভয় পেয়েছিলি না রে?' টুনি চুপ। মা আদর করে বলে, 'দ্যাখ বাবা, যতক্ষণ অজ্ঞানতা ততক্ষণ ভয়। ওরাও তো ঈশ্বরের সৃষ্টি, মানুষ! আর ওদের ভয় পাসনি। ওদের আশীর্বাদেরও মূল্য আছে।'

আনমনে ভাবে টুনি কি সরলতার শিক্ষাডোরে বাঁধা ছিল ছেলেবেলার জীবন। প্রকৃতি-মানুষ উভয় উভয়ের কাছে শিক্ষা নিত। পারস্পরিক সম্পর্কে যান্ত্রিক যুগের সর্বগ্রাসী লোভের আঁচড় পড়েনি তখনো।

এয়ারপোর্ট থেকে গলির মোড়ে এসে টুনি দাঁড়াল যখন, তখন বেলা দ্বিপ্রহর। এই সেই গলিপথ যেখানে গরমের ফি সন্ধ্যায় হেঁকে যেত মলিন ধুতি পরা অস্পষ্ট এক মূর্তি — 'বে-ল-ফু-ল!' বর্ষার সন্ধ্যায় কলাপাতা মুড়ে বিক্রি করত কদম ফুল। শরতের সকালে — 'মা, মুড়ির মোয়া, নতুন গুড়ের খই-এর মোয়া, তিলের নাড়ু?' বলে ডাক উঠত বড় মিঠে গলায়। বিকেল শেষের সাঁঝবেলায় ঘরে ঘরে শঙ্খের ফুঁ পড়তে না পড়তেই বুড়ো ঘুগনিওয়ালার শালপাতার গন্ধমাখা অপূর্ব ঘুগনি মটরের হাতছানি।

প্রথমেই বাড়িতে না ঢুকে ট্রলি স্যুটকেস টেনে বামুনবাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল টুনি কি এক অদম্য টানে। কোথায় গেল সেই টুকটুকে লাল বরণ? শ্যাওলা ধরেছে গায়। ইতি উতি ফাটল। সে জানে বড়মা আজ আর নেই। নেই দীপুদাদার বাবা মেজোজ্যাঠা। ভালো জেঠীর স্বামী সেজোজ্যাঠাও চলে গেছেন। বড় কষ্টে ভুগে ভুগে গেছেন বড় জ্যাঠাইমা। ওনাদের একমাত্র মেয়ে শান্তাদিদির বিয়েতে এই গোটা বাড়ি ফুল মালা, রঙীন আলো, বাহারি পাতা, চাঁদোয়ার জরিতে

ছোট গল্প ঃ বামুনবাড়ি

ঝলমল করছিল। এই দরজার মাথায় বসেছিল রৌশনচৌকি। গাল ফোলানো সিড়িঙ্গেঁ দুই সানাই বাদক পাড়া মাত করে রেখেছিল। ভারী ভারী বেনারসি আর গয়নায় জ্যাঠাইমাদের ব্যস্ত ঘোরাঘুরি, সুসজ্জিত ছেলে মেয়েদের অকারণে হো হো হাসি, খেলাধূলা। পিছনবাগের ভিয়েনের নরম সাদা ধোঁয়া ওঠা কড়াতে টগবগ টগবগ সাদা তুলোর বল রসগোল্লাদের নাচানাচি। ওরা দু বোন এতো আলো হাসি বাজনার মাঝে ঠিক যেন ফুলকুমারী রূপকুমারীর মতন ঘুরে বেড়াচ্ছিল।

টুনি সবচেয়ে অবাক হয়েছিল সেদিন মাকে দেখে। সোনার জলডুরে লাল সবুজের কলমকারি নকশা আঁকা শাড়ি, খোঁপায় ফুলমালা, গায়ে সোনার আভরণ। ঠিক যেন দূগ্গাঠাকুর। কিন্তু পরে আর কখনো মাকে ওই গয়নাগুলো পরতে দেখেনি সে। মনে হয় একদিনের আনন্দযজ্ঞে ওই খান কয়েক গয়না বড়মার মায়ের প্রতি ভালোবাসার দান ছিল যা মা পরে ফেরত দিয়েছিল।

ভোজবাজির মতন কোথায় মিলিয়ে গেল সে সব দিন? একরাশ সুসজ্জিত কুশীলবরা এল। আনন্দ হাসি গান আলোর বিকিরণ দিয়ে আবার হারিয়ে গেল কোন ধূসর শূন্যে। বাপ মা ছাড়া যে শিশুগুলোর জীবনে তিনকুলে আপন বলতে কেউ ছিল না, তাদের জীবনে বামুনবাড়ির স্নেহের সজল পলিমাটির কদরটুকু বুঝতে বড় দেরী হয়ে গেল।

টুনির মনে পড়ে, ইস্কুলের পরীক্ষায় ভালো ফল করলে বড়মার থেকে দুই বোনে বই উপহার পেয়েছে। বছর ভর পালা পার্বণে পেয়েছে হাত ভরা ফলের টুকরো। প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে জ্যাঠাইমারা ওদের স্নেহ করেছে। কখনো দুষ্টুমিতে কোনো অন্যায়ের আভাস পেলে নির্দ্বিধায় বকুনি দিতেন জ্যাঠারা।

যাঁদের কাছে এই স্নেহাদরের কথা ব্যক্ত করে মনের কৃতজ্ঞতা জানানোর দরকার ছিল, সময়ে তা করা হল না। কালের চোরা স্রোতে ভেসে গেছে সেই ক্ষণ, সেই মানুষ। শুধু পড়ে আছে মনের বেলাভূমে চিকচিকে কিছু সোনা স্মৃতি।

হঠাৎ চোখ গেল বামুনবাড়ির পিছন দেওয়ালে। কি নধর কচিপাতার ঠাসবুনটে এক অশ্বত্থের চারা! কচিপাতার মুখে আবার এক বিন্দু জল। ঠিক যেন টুনির মনের সবুজ এক সুখস্মৃতির পাতা। কৃতজ্ঞতার আঁখিবিন্দুতে ভরা। বাড়ির দিকে ফিরে চলে সে। প্রকৃতিও মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে টুনির থেকে এতগুলো বছরের ব্যবধানে। সেই মহাবৃক্ষ নীম আর নেই। কাটা পড়েছে আমগাছটাও। কুলতলির মাঠে এখন 'বৃন্দাবন কুঞ্জ' আবাসন। তার অজস্র চৌখুপিতে 'হলদে সবুজ ওরাং ওটাং, ইঁট পাটকেল চিৎ পটাং', সংসার জীবনের নাট্যকাব্য। মন যেন আষাঢ়ের জল ভরা মেঘ হয়ে যায় টুনির। কোথায় গেল সেই ঝালর পাতার নারকোল বন, পূর্ণিমায় চাঁদের আলো পড়ে একশো রূপোর চুমকিতে সেজে উঠত ওরা। কোথায় বা সেই ঝাঁকড়া তেঁতুল গাছের ডালে পাতায় সূর্য্যের আলোর নাচন আর হাজার পাখির ডাক! পুবে কলাবন আর তার ফাঁক দিয়ে একচিলতে রেল লাইন।

টুনি যেদিকে তাকায় সেদিকেই শুধু ইঁট কংক্রিটের জঙ্গঁল। প্রকৃতি যখন তার ছেলেবেলার চারিপাশে পড়ে পাওয়া চোদ্দ আনার মতন পড়ে থাকত তখন কোনোদিন তাকে যত্নে কুড়িয়ে রাখার প্রয়োজন বোধ করেনি টুনি। ভেবেছে, সে তো ছিলই, থাকবেই। আজ বড় ব্যস্ত ব্যাকুল চোখে ছেলেবেলার সঙ্গীসাথীদের খুঁজে বেড়ায় টুনি। কেউ দেখা দেয়, কেউ দেয় না। কেউ হারিয়ে গেছে বয়েসের ভারে, কেউ মরেছে প্রোমোটারের লোভের কোপে।

পায়ে পায়ে ওদের বাড়ির খিড়কি দরজায় এসে দাঁড়ায় টুনি। ঝুপসি বেগনভেলিয়ার গাছটা সাদা গোলাপী ফুলের ভারে কি ঝলমলে! লম্বায় বড় হয়েছে ছাদ অবধি। এতক্ষণে মুখে হালকা হাসি ফোটে টুনির। জীবনের কত পরম লগন কেটে গেছে এই ছাদে। কি লোডশেডিং হত তখন বাপস! টুনিরা ছাদে লণ্ঠন জ্বেলে মাদুর বিছিয়ে পড়তে বসত। মা বাটি ভরে কচি শশা পেঁয়াজ দিয়ে মুড়ি মেখে দিত। আর লাল টুকটুকে তরমুজের শরবৎ।

কোনো কোনো দিন আকাশ ছেয়ে যেত কালো মেঘে। রূপোলী বিদ্যুৎ ফালা ফালা করত আকাশটাকে। মেঘের কি ডাক! কাল বৈশাখীর মত্ত মাতনে উড়ত চুল, ফ্রক, বইখাতা, মাদুর। তারপর বৃষ্টি। সঙ্গেঁ শিল পড়লে কুড়িয়ে খাওয়ার ধূম। শিল খেতে কোনো কোনো দিন সব কাজ ফেলে এসে জুটত মা।

বাড়ির ভেতরে প্রবেশ করে টুনি। 'দাঁড়িয়ে আছ তুমি আমার গানের ওপারে / আমার সুরগুলি পায় চরণ, আমি পাইনে তোমারে।' গান শুনছে মা। দরজার আওয়াজে বেরিয়ে এল। 'কি রে টুনি! এত দেরী?' অস্ফুটে টুনি বললে, 'বহুযুগের ওপার থেকে এলাম মা, দেরী হয়ে গেল।' মা কি বুঝল কে জানে। চিবুকে চুমু খেয়ে বললো, 'আয়, তোর জন্য তালের বড়া ভেজেছি। বড্ড ভালোবাসতিস। দুটো খেয়ে আগে জুড়ো।'

'মা, বামুনবাড়ির কি অবস্থা! একেবারে ভেঙে পড়েছে, কোনো মেনটেনান্স নেই।'

'হুঃ,' নাক দিয়ে অদ্ভুত এক আওয়াজ করে মা। মানুষেরই মেনটেনান্স নেই, তো বাড়ির!' একটা চাপা শ্বাস ফেলে টুনি। এতগুলো বছরে প্রয়োজনে টাকা পাঠানো ছাড়া মায়ের মনের কোন খোঁজই রাখা হয়নি। কখনো কি ভেবে দেখেছে কত বাধা বিপত্তির কাঁটা ঝোপের মাঝে সংসারটাকে কেয়াফুলের মত ফুটিয়ে রাখতে কত ত্যাগ, কত তিতিক্ষার ভেতর দিয়ে যেতে হয়েছে মাকে!

মনের জালনার গরাদ ধরে এসে দাঁড়াল বড়মা। বড়মার কাছে সেদিন কান ফুটিয়ে, গলা ফাটিয়ে কেঁদে বাড়ি ফেরার সময় হাতে দুটো ক্ষীরের নাড়ু দিয়েছিল বড়মা। স্নেহ গদ্‌গদ্‌ সুরে বলেছিল, 'মাইয়া জন্ম লইয়্যা আস্‌ছস্‌। অ্যাতো কম চক্ষের জলে জীবনের ধন উসুল হইব না মানিক!' তারপর এমনিই চিবুকে চুমু খেয়ে বলেছিল, 'খাও! লারু খাও!'

আজ মায়ের হাতের ভাদ্র মাসের তালের নাড়ু খেতে খেতে টুনির দু চোখে আষাঢ়ের বাণ ডাকলো। কান্না হাসির দোল দোলানো ছেলেবেলার দিনগুলির রঙীন স্মৃতি বুকের মাঝে নবীন করে রাখার অঙ্গীকার নিল টুনি মনে মনে।